বং ঢং ডট কম্
www.bongdhong.com

বইমেলাতে নিরুদ্দেশ

মৈত্রেয়ী কুমার

গল্প হচ্ছিল আমার এক পুরনো বন্ধুর সাথে বইমেলা নিয়ে। প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত ওদের পরিবার। সমাজের সর্বত্র দুর্নীতি আর আভিজাত্যহীনতার যে বেনোজল ঢুকেছে, তার থেকে রেহাই পায়নি প্রকাশনার ব্যবসায়ও।

“এক শ্রেণীর চালিয়াত, দুটো কাঁচা পয়সার জন্য নোংরা সাহিত্যের চুলবুলানিকে উস্কানো দিয়ে দিয়ে একেবারে গাড্ডায় এনে ফেলেছে সাহিত্যের গোটা পরিবেশটাকে।” এইসব বলে দুঃখ করতে করতে আচমকাই সে বলে বসল, “সেই যদি তুমি ফেব্রুয়ারীর গোড়া পর্য্যন্ত আছ তো এসো না একদিন ওখানে, পিপুল!” ওখানে মানে বইমেলায়, বন্ধুর প্রকাশনী সংস্থায়। “চা ফা খাবে, দুটো আড্ডাও হবে। আমিও তো এখন ওখানেই আখড়া বেঁধে পড়ে থাকব হপ্তা দুয়েক।”

বহুবছর বাংলার বাইরে থাকার জন্য বইমেলায় যাওয়া আর হয় না। গিয়ে দেখি বিকেলের আকাশে শীতের সন্ধ্যে উটকো লোকের মতন আচমকা হাজির হয়েছে। পাখিগুলো ভড়কে গিয়ে বিস্তর প্রতিবাদী সুরে ডাকাডাকি করে ডেরার দিকে উড়ে যাচ্ছে। স্টলগুলোতে যার যা সাধ্যমতন ব্যানার, রবীন্দ্রসঙ্গীত, পিতিমারা প্লাস্টিকের কাপে আশি টাকার কফির গন্ধ, মশলামুড়ি সিঙ্গাড়া চপ, গুলতানি, মেয়েদের পিছনে টিটকিরি, হাতে হাতে সবারই কিছু না কিছু অমূল্যরতনের খোঁজ পাওয়া বইএর ব্যাগ। বন্ধুর প্রকাশনী স্টল খুঁজতে খুঁজতে এক বিকট চ্যাঁচামেচির আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে গলা বাড়িয়ে দেখি লটারির সুপার ডুপার বাম্পার টিকিট বিক্রির বিজ্ঞাপন হচ্ছে, বিস্তর লোকও জমেছে। গুঁতোগুঁতি চলছে। পাশ কাটিয়ে ঘাড় ঘোরাতেই খুঁজে পেলাম যা চাইছিলাম। বন্ধুবর উঠে এসে সাদরে ভেতরে নিয়ে গেল।

স্টলে মন্দ ভিড় নয়। বিক্রিবাটাও চলছে ভালো। বন্ধুর মেজাজ শরিফ। চায়ে চুমুক মেরে বললে, “যাই বলো হে, কলকাতার মতন এমন হৃদয়খোলা পাঠক তুমি ভূভারতে পাবে না।”

বক্র হেসে বললাম, “তার জন্য বোধকরি বাঙালীর সবজান্তা চরিত্রটি দায়ী। সব জানা চাই যে!”

বন্ধুও হেসে বললে, “সে তুমি যা বলো, কী জানো, এ এক দুরন্ত নেশা। লেখক, পাণ্ডুলিপি, নতুন প্রচ্ছদ, একটা নতুন কাপড়ের মতন গন্ধ, পাঠকদের অনুসন্ধানী চোখ, সামান্য ভিজে ভিজে নতুন পৃষ্ঠা নেড়ে চেড়ে দেখা, তারপর সব পেয়েছির স্বর্গসুখ নিয়ে বই ঝোলাবন্দি করা — এসবের ভিতর যে না থেকেছে সে বুঝবে না ভাই!”

বন্ধুর বলা কথাগুলো মন দিয়ে শুনলাম। কিছু বললাম না। মনে মনে হারিয়ে গেলাম সেখানে, যেখানে কারও হারিয়ে যেতে কোনো মানা নেই, সেই আমার ছেলেবেলার দিনগুলিতে। বই, পাণ্ডুলিপি, বইমেলা, চা — এই শব্দগুলোর সাথে আমি যে আজন্ম লালিত, সে কথা কি ভুলবার?

আমার জন্ম সত্তরের কলকাতায়। গোটা বাংলা দাউ দাউ জ্বলছে তখন। নকশাল আমল। সূর্য্য পাটে নামলেই ঘরে ঘরে উদ্বিগ্নতা, আতঙ্ক। শুনেছি মা-জ্যাঠাইমা বাবা-জ্যাঠারা না ফেরা পর্য্যন্ত উঠোন পেরিয়ে পেয়ারা গাছের তলায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন গলিপথে চেয়ে। মৃত্যুর ছায়ার মতন পুলিশের কালো জালঘেরা গাড়িগুলো কলকাতার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াত। বড় রাস্তা দিয়ে কখনো বা আবার যমদূতের মতন প্রচণ্ড বেগে ছুটে যেত। ধরপাকড়ের কোনো মা-বাপ ছিল না। একবার ভ্যানে ওই কালো জালের পিছনে শিকার ফেলতে পারলেই হল। আজ যে পাড়ার তরতাজা যুবক টগবগিয়ে রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে, কাল তার আর কোনো সুলুক সন্ধান পাওয়া যেত না। কার দাদা-কাকা-ভাই-ছেলে এইভাবে হঠাৎ কখন যে মিলিয়ে যাবে তার আঁচটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যেত না।

আমার বয়স তখন বছর চার-সাড়ে চার হবে। এমনই এক দমচাপা দিনে বাবা টুণ্ডলা থেকে আসা একটা টেলিগ্রাম পেয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মাকে বলল, “আমি কালই ওকে লিখে দিচ্ছি — ডোণ্ট কাম্ নাও। সিচুয়েশন ডেঞ্জারাস্।” মাও দোনামনা করে সম্মতি দিল।

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

তবু এক রবিবারের বেলায় হঠাৎ আমাদের খিড়কি দরজাটা ‘দাম্’ করে খুলে গেল, আর কেউ একজন বিকট গলায় চিল্লাতে লাগল — “কই রে! ইরা? কই সব? কোথায়, কোথায়?” চিৎকারে সারা মহল্লা মাথায় উঠল। বাবা দাড়ি কামাচ্ছিল, হাঁকাহাঁকি শুনে আধগাল দাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, “তুমি? আমার টেলিগ্রাম পাওনি?”

(Photo: Biswarup Ganguly/Wikimedia Commons)

দিদি আমাকে দুধ-মুড়ি খাওয়াচ্ছিল। আমরা উভয়ে ড্যাবড্যাবিয়ে দেখলাম এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, চোখে চশমা, বড়সড় একখানা পেটের মালিক জগদ্দল পাথরের মতন একটা হোল্ডল আর একখানা সুটকেস সমেত উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মহা বিরক্ত হয়ে বাবা বলল, “নিজেদের বাড়িতে নিজেরাই আছি। খামোখা কোথায় কোথায় বলে চেল্লাচ্ছ কেন! টেলিগ্রাম পাওনি?”

জবাবে হা-হা-হা-হা বুকফাটা হাসিতে উঠোন ফাটিয়ে হেসে উঠে লোকটা বললে, “তুমি ভাবলে কী? তোমার ওই চামচিকের সঙ্কীর্তণ শুনে আমি ছুঁচোর গর্তে ঢুকে যাব? ভায়া, এ হল সাহিত্যিকের বুকের পাটা। কী জিনিস, অ্যাঁ?” নিজের বুকে দমাদম দুই কিল বসিয়ে কথা শেষ করল — “তোমার ওই হরিপদ কেরানীর ছাতি নয়, বুঝেছ?”

মা তড়িঘড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম সারলো। “মামা হয়” বলে আমাদেরও পেন্নাম ঠেকাল। তারপর মামাকে বগলদাবাই করে ঘরে ঢুকে গেল।

মা-কে “অ্যাই, চা কর, চা কর!” বলে, মামা ঘুরে ফিরে ফের বাবার কাছে দাঁড়ালেন। বাবা গম্ভীর মুখে তাঁর অর্ধসমাপ্ত কাজে ব্যস্ত। গরম চায়ে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে চুমুক মেরে মামা বললেন, “এভরিথিং ইজ অ্যারেঞ্জড্। কিস্যু ভেবো না। পরশু চলে যাচ্ছি সুন্দরবন।”

চমকে উঠে বাবা বলল, “সু… সুন্দরবন!”

মামা বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, “সোর্স আছে। মাথাভাঙ্গা নদীর কাছে গ্রামে একটা খুঁটির খবর পেয়িচি। ভাবতে পারো? কী জিনিস, অ্যাঁ? একদিকে কেঁদো বাঘ…”

“আর অন্যদিকে তোমার পেঁদো বুদ্ধি!” বাবা মামার কথার শূন্যস্থান পূর্ণ করে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম ধুতে মন দিলো।

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

এবার আমাদের যৌথ খিক্ খিক্ হাসি শুনে মামার মনে পড়ল আমার জন্য কিছু হাতে করে এনেছেন, সেটা দিতে হবে। “এখন থাক না, নাণ্টুদা,” মায়ের আপত্তি ধোপে টিকল না। অতএব বাবা, মা আর দিদি মিলে মামার সেই গণ্ডারের মতন হোল্ডলটা হেঁইও হেঁইও করে ভিতরে নিয়ে এলে মামা ‘মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার’-এর মতন তার বক্ষ এবং উদরদেশ চিরে ফেলে খাবলাতে শুরু করলেন। রাশিকৃত বই রে-রে করে রক্তবীজের বংশের মতন আমাদের ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের উপর থপাথপ পড়তে লাগল মামার পাজামা, পাঞ্জাবী, ফতুয়া, তোয়ালে, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম মায় হাত আয়না, চপ্পল জোড়া পর্য্যন্ত। বিস্তর খোবলানোর শেষে, “অ্যাই! পেয়িচি!” বলে একতাল অন্তর্বাসের তলা থেকে বেরুল চুহাসম একখানা লাল গাড়ি। সেটিকেই মাথায় তুলে বরণ করে নিলাম। মহাখুশি হয়ে মামা বললেন, “নেঃ নেঃ যাঃ যাঃ!” তারপর দিদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী র‍্যা? তুই আমাকে চিনতে পারিসনি না?” লজ্জা পেয়ে দিদি ঢক করে মাথা নেড়ে আমাকে নিয়ে ছুটে পালাল।

রাত্তিরে খেতে বসে বাবা বলল, “শোনো হে, এ তো কোনো ছেলেমানুষির ব্যাপার নয়! নকশাল দেখব, নকশাল দেখব! এ কী চিঁড়েখানার সাদা বাঘ? আমি ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি। এই তো গত পরশুই পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে পুলিশের চিরুনি তল্লাসি হয়ে গেছে।”

“পু… পু…!” মামা রুটির মধ্যে আলুকুমড়ো ভরে চোখ গোল করলেন।

“আজ্ঞে হ্যাঁ, পুলিশ!” বলে বাবা দুধটুকু শেষ করে আবার বলল, “এতগুলো বছরে তুমি সামান্য গড়েহাটের বাজার থেকে আমাদের বাড়ি তো চিনে আসতে পারো না। ভুলভুলাইয়ার হাজার পাক খেয়ে, আছাড়ি পিছাড়ি ন্যাজে গোবরে হয়ে ঘরে ঢোকো। আর তুমি যাবে একেবারে সোঁদরবন?”

মামা মুখ গোঁজ করে বললেন, “তোমাদের কলকাতায় বাপু গলিগুলোই অমন! ল্যাজা মুড়ো আছে কিছু? আর পুরো সোঁদরবন কি আর? ওই মাথাভাঙ্গা…”

“কেন?” বাবা দাঁত খিচিয়ে বলল। “শুধু হাত-পা ভেঙে আর মন উঠছে না?” মামার ছিলও বটে যত্র তত্র এই আছাড় খেয়ে পড়ে যাবার বাতিক। প্রায়শই দেখেছি হাতে পায়ে নাকে কিছু না কিছু।

বাবা আঁচাতে উঠে গেলে মামা পড়লেন মা’কে বোঝাতে — “শুনিসনি কি, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দ্যাখো তাই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্যরতন! কে বলতে পারে, নকশালদের জীবন ছেঁচে লেখা এই উপন্যাসই হয়তো আমাকে নোবেল এনে দেবে?”
মা জাঁতি দিয়ে সুপুরি কুচো করতে করতে বলল, “নাণ্টুদা! শুয়ে পড়, রাত বেশ হল।”

আমরা দুই ভাইবোন ঘাপটি দিয়ে শুয়ে বড়দের কথা গিলছি, হঠাৎ সদর দরজায় প্রবল ধাক্কা। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দেখি বাবা দরজার মোটা খিলটা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মা রান্নাঘর থেকে বঁটি নিয়ে এসে বাবার পিছনে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় রি-রি-রি-রি শুনে দেখি মামা মশারির ভেতর বসে কাঁপছেন। দিদি একলাফে বারান্দার বড়বাতিটা জ্বেলে দিল। কে যেন বাবার নাম ধরে ডাকছে। বাবা সন্তর্পণে দরজা খুলতেই ঝড়ের মতন ভিতরে ঢুকে এল বাবার পাড়াতুতো বন্ধু মণ্টুকাকা।

আমাদের গলির মুখে বড়রাস্তার ওধারের তেতলা বড় বাড়িটা ছিল এই সামন্তদের। এককালে এদের বাপ ঠাকুর্দা কাঠের গোলা, গুদোম করে বিস্তর টাকাকড়িও করেছিল। ছোটভাই মণ্টুই এখন ব্যবসাপত্র দেখে, কারণ বড়ভাই গোপাল পাগল!

আমার কিঞ্চিৎ এঁচোড়ে পাকা বয়েসকালে দিদির কাছে শুনেছিলাম, আমাদের পরমাসুন্দরী রাঙাপিসিমার সঙ্গে গোপালের না কি কিছু ইণ্টুমিণ্টু ছিল। ঠাকুর্দা ছিলেন দুঁদে গৃহস্থ। তাঁর যখন নজরে পড়ল যে সেজো মেয়ে বিকেল হলেই ছাদে উঠে করবীর ডাল ধরে ‘মনো দোবো না, দোবো না রে’ গুনগুনাচ্ছে আর ঠিক সেই সময়েই সামন্তদের বড় বৃষস্কন্দতুল্য দামড়াটাও ছাদে হাওয়া খেতে বেরোচ্ছে, তখন কালমাত্র বিলম্ব না করে তিনি জব্বলপুরনিবাসী মার্বেল ব্যবসায়ী তাঁর এক বন্ধুপুত্রের সঙ্গে চারহাত এক করে দিলেন। ব্যস, আর যায় কোথা! গোপাল বিরহী যক্ষ বনে গেল। রাশি রাশি প্রেম কাব্য ভোঁ কাট্টা ঘুড়ির মতন উড়তে লাগল সামন্তবাড়ির আনাচে কানাচে, ছাদে আলসেতে।

পাগলের অবস্থা বদ্ধ হল রাঙাপিসিমার অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদে। শোনা যায় গোপাল তখন ‘দ্য ডোর’ নামে এক ডার্ক ট্র্যাজেডি লেখার চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছিল। কিন্তু লেখা আর এগোয় না কারণ চাদ্দিকে গোপাল দেখে এক ধুমসো কালো বন্ধ দরজা। সেই দরজার ওপারে যাবার বাসনায় সে লম্ফঝম্ফ শুরু করে দিল। পাড়ার ধোপা, নাপিত, কাজের বৌ মায় পুরুতদের ধরে ধরে “দ্য ডোরের চাবি দেখেছিস, চাবি?” বলে বেড়াতে লাগল।

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

ফিরে যাই সেই আতঙ্কে ঠাসা রাতে। মা জল গড়িয়ে এনে দিলে চোঁ করে সব জলটুকু খেয়ে মণ্টু সামন্ত বাবাকে বলল, "আজ বরাত জোরে খুব বাঁচা বেঁচে গেছি ভাই! তবে কাল কপালে কী আছে জানিনা।"

"খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই, আজ বিকেল থেকে কুয়াশা পড়েছিল," মণ্টুকাকা বলে। "কাঠগোলার হিসেব নিকেষ চুকিয়ে বেরোতে বেরোতে একটু দেরীই হয়েছিল। একা মানুষ কোন দিক সামলাই! তা পথে নেবে দেখলুম, দু হাত দূরে কী আছে দেখা যাচ্ছে না। পরশু এলাকায় পুলিশ রেড হয়ে গেচে ভেবে বড়রাস্তা মাড়ালুম না। পঞ্চাননতলার ভিতর দিয়ে দিয়ে সোজা এসে পড়লুম। রাস্তায় একটা কুকুর পর্য্যন্ত নেই। কুলতলির মাঠের ধার বরাবর এসেছি, হঠাৎ কোত্থেকে কুয়াশা ফুঁড়ে উঠে এল চারটে লোক। চেহারা পেটানো, মুখগুলো কালো বাঁদুরে টুপিতে ঢাকা। আর প্রত্যেকের হাতে চক্‌চক্‌ করছে কি বল তো?" সামন্ত থামল। আমরা সবাই স্পিকটি নট্‌।

"ওয়েপন!" সামন্ত বলল।

"ক্কি… কী বলছেন মশাই? ও বাব্বাঃ, ওয়ে… ওয়ে… ওয়েপন?" মামা মশারির ভিতর থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন।

সামন্ত মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, ওয়েপন। চক্‌চক্‌ করছে। পাতলা ফলার মতন চাকু, ইয়াব্বড় ভোজালি, একখানা হাঁসুলির মতন কী এক অস্তর আর বাঁটাঅলা ছোরা। সবাই আমাকে চোখের নিমেষে ঘিরে ফেলল। আমি ভাবলুম, আজ এখেনেই তবে! এভাবেই সব শেষ! ওদের একজন আমার পেটে চাকুটার মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে বলল, 'অ্যাই শালা! তোর দাদা কী আরম্ভ করেছে রে বে?' আমার মুখে টুঁ শব্দটি নেই। তখন পেট থেকে চাকু বুকে খোঁচানি দিয়ে বলল, 'দ্য ডোর কী রে, বে? ওটা তো আমাদের কোড। তোর দাদা জানল কী করে?' এবার অতি কষ্টে মনের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমি বললুম, 'আমি দাদার এসব কিছু জানি না!' চাকুর ফলা এবার আমার গলার নলীতে চাপ দিচ্ছ। লোকটা হিসহিসিয়ে বলল, 'গাড়লটা ধোপা নাপিত কামার কুমোর, সব শালাকে কোডনেমটা বলে বেড়াচ্ছে? সামলাবি! নয় তো তোর এই পেটটা চালকুমড়ো ফালি হয়ে যাবে।' বলেই যেমন এসেছিল তেমন কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। আমি ভাই আর কোনোদিকে না তাকিয়ে ছুটতে ছুটতে তোমাদের এখানে এলুম। বলা তো যায় না, যদি চালকুমড়ো কাটার ইচ্ছেটা ওদের এক্ষুনি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে?"

বাবা ঘরময় অস্থির ভাবে পায়চারি জুড়ে দিল। মামার কোঁ কোঁ শুনে বলল, "কেমন, জীবনমুখী গপ্পো লেখার ইচ্ছে নেই আর? যাও, এক্ষুনি মণ্টুকে ওর বাড়ি অবধি এসকর্ট করে এসো!"

মামা আমতা আমতা করে বললেন, "ভাই, আমি?"

বাবা গর্জে উঠল, "হ্যাঁ, তুমি! নোবেলজয়ী সাহিত্যিক হবে! আরে বাবা, নোবেল কি জোছনাপিসিদের বাড়ির গাছের কৎবেল যে পাড়লেই পাবে?"

উত্তরের অপেক্ষা না করে দরজার খিলখানা হাতে নিয়ে বাবা গেল বন্ধুকে পৌঁছতে। ঘটনাটা মামার মনে কী রেখাপাত করেছিল কে জানে, সোঁদরবনের সোর্স পার্টিদের ফিরিয়ে দিয়ে ক'দিন বাদে নিজেও টুণ্ডলায় ফিরে গেলেন। বাবা গলা ফাটিয়ে গেয়ে বেড়াল —

"এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি
…সে অবধি সই, ভয়ে ভয়ে রই…
আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই।"

আর মা মুখে আঁচল চেপে হাসির গমক থামিয়ে শুধু বলল, "তুমি যা তা!"

ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন, ইংরিজি ক্লাসে হঠাৎ ঘোষণা হল, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজের নিরাপত্তারক্ষীদের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছেন। স্কুল ছুটি হয়ে গেল। তখনও বাড়িতে বাড়িতে রেডিওর যুগ। গলি পথে এর ওর বাড়ি থেকে ভেসে আসছে গা হিম করা সংবাদ। সাধারণ মানুষ শুভবুদ্ধি হারালে কি নৃশংস না হতে পারে! কত নিরীহ শিখ পরিবার এক রাতের নিষ্ঠুরতায় ছারেখারে গেল। কলকাতার পথঘাট আবার রক্তপিপাসু। জরুরী অবস্থা জারি করেছে সরকার। আতঙ্ক, সন্ত্রাস দাউদাউ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। আবার শুরু হল বাবা-জ্যাঠার বাড়িতে ফেরত না আসা পর্য্যন্ত উদ্বেগ। মাপা হাসি, চাপা কথা।

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

সপ্তাহখানেক পরে, পরিস্থিতি তখনও গুমোট, সকাল দশটা নাগাদ রুটি তরকারি খেয়ে পড়তে বসেছি, এমন সময় হুড়মুড় করে সেই দুটো গন্ধমাদন সমেত মামা হাজির। উঠোনে বাক্স প্যাঁটরা সমেত হুমড়ি খেয়ে পড়েই বললেন, "উ-ফ্-ফ! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়! শালার ব্যাটা শালা, ট্রেন না কচ্ছপের পিলে রে! শুনেচো কখনো আঠারো ঘণ্টা লেটে কেউ চলতে পারে? পারে! ইণ্ডিয়ান রেল!"

আমাদের প্রাথমিক সম্বিৎ ফিরে পেতে না পেতেই শুরু হল মামার হাঁকডাক — "ইরা! ইরা! চা দে রে!" মামার মুখে ক্লান্তির ছায়া, গালে বাসি দাড়ি, কিন্তু চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। বাবাকে বললেন, "বুঝলে ভায়া, গত তিন বছর আমি ষাঁড়াষাঁড়ি লড়াই করে আমার নব্য উপন্যাসখানা শেষ করিচি। গেসলুম সেই গুজরাটের ইণ্টিরিয়রে। বালি কামড়ে পড়ে থেকে নিজের পেটে নিজে লাথ মেরে মেরে এই উপন্যাসখানা লিকিচি। কী জিনিস, অ্যাঁ? তোমার এই কলকেতার বুদ্ধিজীবী টুদ্ধিজীবীরা না, ভাবতেও পারবেনা। আরে ভায়া, বকফুলের বড়া ভাজা আর পোনামাছের ঝোল খেয়ে কি সাহিত্য হয়? ইউ ওয়ের রাইট। সেই যে, মনে নেই, নকশাল? জীবনমুখী? তুমি ঠিক বলেছিলে, সাহিত্য করতে গেলে না, মনে বাঘের বল চাই।" বলে বাবার পাশে গুছিয়ে বসলেন মামা।

বাবা নিরুৎসাহী সুরে বলল, "কলকাতার এই অবস্থায় তুমি এলে কি না তোমার বইয়ের পাবলিসিটি করতে! কার মন মেজাজ আছে এখন?"

"কেন? কেন?" মামাকে চিন্তিত দেখাল না আদৌ। "এভরিথিং ইজ্ অ্যারেঞ্জড্। কিস্যু ভেবো না। আজ বাদে কাল প্রতিমার দিদির বাড়িতে একটা বিরাট ককটেল পার্টি, বুঝেছ! মেয়ে-জামাই আমেরিকা থেকে ফিরল কি না! তো আমারও ইনভিটেশান। কলকাতার নামী দামী বিদ্বজনরা থাকবে। ডোণ্ট ইউ থিঙ্ক ইটস্ আ গ্রেট অপারচুনিটি টু ইণ্ট্রোডিউস মাই নিউ উপন্যাস 'আজব গুজরাটের গুজব কথা'!"

শুনে মুচকি হাসল মাত্র বাবা। মুখে বলল, "সবার আগে ওই দাড়িগুলো কাটো তো! শিখ সন্দেহ করে পাবলিকে শিক কাবাব বানালে না!"

হা-হা-হা হেসে বাবার উরু থাবড়ে বাবাকে চুপ করিয়ে দিলেন মামা। তারপর গলা উঁচু করে মা'কে বললেন, "ইরা, কাল রাত্তিরে আমার জন্য চাল নিবি না।" মা বাধ্য মেয়ের মতন চায়ের কাপ নামিয়ে বলল, "তথাস্তু!"

পরদিন সন্ধ্যেবেলা মামা বেশ মাঞ্জা মেরে ককটেল পার্টির ক্যাকাফোনি করতে করতে বেরোলেন। কিন্তু রাত এগারটায় শুকনো মুখে বাড়ির দরজা ধাক্কিয়ে ভিতরে এসে মা'কে বললেন, "ইরা, দুটো ডাল ভাত হবে না কি রে?"

দিনকাল ভালো নয় বলে মামা না ফেরা পর্য্যন্ত আমরা জেগেই ছিলাম। বাবা মামার আর্জি শুনে কৌতুকে ফেটে পড়ল। গজগজ করতে করতে মামা বললেন, "কী বিটকেল পার্টি হে! আর তেমন উটকেল, স্যরি উটকো, সব লোক। খাবার বলতে কিস্যু না, কেবল ক'টা কি কাঠি ফুটনো খাবারের টুকরো। থাকার মধ্যে শুধু লাল জল! তাই গিলে গিলে সব মাতোয়ারা। একটা সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে আলোচনা করব সে উপায় আছে?"

বাবা বিড়িতে সুখটান মেরে বলল, "তা তুমি লালজলে লাল কমল হয়ে ভাসলেই পারতে! ছুটে এলে কি না বোনের বাড়ির এই ম্যাদা মার্কা ডালভাতের লোভে!"

মামা ক্ষেপে গিয়ে বাবাকে শাসাতে লাগলেন — "কেরানী কোথাকার! সাহিত্যের কমলে কামিনী হয়ে ফোটার তুমি কী বুঝবে হে! বিড়ি টানছো, তাই টানো!" তারপর পরম তৃপ্তিতে ডালভাত খেতে খেতে মা'কে বললেন, "বাঙালের গোঁ জানে না তো! আই উইল গো উইদিন পিলার টু পোস্ট! কলকাতার পাঠকরা এতদিনে চিনবে সত্যিকারের সাহিত্য কাকে বলে। না খেয়ে না দেয়ে দেহের রক্তে লেখা সাহিত্য! ইয়ার্কি?"

সত্যিই মামা চারপাশের কার্ফু, বাধা বিপদ তোয়াক্কা না করে কলকাতার প্রকাশনা সংস্থা, চেনা অচেনা সাহিত্যিক, বড়লোক শালীর ইনফ্লুয়েন্সে পাওয়া বিভিন্ন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট সব জায়গায় চরকি পাক খেতে শুরু করলেন। বাবা আড়ে আড়ে দেখত, কিছু বলত না। রাতে খাবার টেবিলে বসে মামা দিনযাপনের শ্রান্তি, ব্যর্থতা উগরে দিতেন — "শালার ব্যাটা শালা আবার সাহিত্য অকাদেমীর সিলেকশান সেকশানে আছেন! আমার পাণ্ডুলিপিখানা উল্টে পাল্টে দেখে বলা হল, 'আপনি অনেক কিছু লিখে ফেলেছেন। ছোট উপন্যাস নিয়ে আসুন, তখন ভেবে দেখব।' আরে উজবুক! আমি পথে পথে পড়ে থেকে জীবন দেখিচি, রিসার্চ করিচি। আমি বেশী লিখব না তো কে, তুই লিখবি?"

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

আবার কোনোদিন মামা বলতেন, “লোকটা কি না একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক! এই জ্ঞান? বলে আমার লেখায় নাকি উপাদান বেশী, গল্প কম! আরে এ কি তুই কালোর দোকানের বাতাসা ওজন করছিস? পঁচাত্তর খানা ফ্রি কপি ওনাকে দিতে হবে বই হলে। কেন রে বাপু? এ কি আমার ভাগ্নার বিয়ের কার্ড বিলুচ্চি? ছোটলোক!”

শুক্তো বেশ ভালোবাসতেন মামা। তাই একদিন ভাতপাতে বড় বড় কলাইয়ের বড়ি দেওয়া শুক্তো দেখে প্রীত হয়ে মা’কে বললেন, “একটা ক্ষীণ আশার আলো রে, ইরা! কাল যাবো এক নামী পাবলিকেশানের রিভিউ সেকশানের হেড ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে দেখা কত্তে। দেখি কী হয়! এত মাথা ঠুকছি, তবু দ্যাখ!”

সে রাত্রে বাবা মা’কে বলল, “ওই মাথা ঠুকতেই জানে। মাথাটা ঠোকার জন্য নয়, খাটানোর জন্য! এক-এক পাতার ডায়লগ লিখবে, কে পড়বে বল তো? আর শেষমেষ কি না ঝুনঝুনওয়ালা!”

দিদি ফুট কাটে — “মা আজকাল দৈনিক মিনিমাম ষাট কাপ চা বানাবার রেকর্ড করছে বাবা!”

মা সামলায়। ফিসফিস করে বলে, “থাক না, বাপ ছিল না মাথার উপর। ভালো হোক মন্দ হোক যা করেছে ওই তো করেছে।”

বাবার আশঙ্কা সত্যি হল। ঝুনঝুনওয়ালা মামার পাণ্ডুলিপিটা মিনিট দশেক পড়ে বললে, “আপনি তো বহুত কুছ লিখেছেন মিস্টার সেন। কুছ পিলাইয়ে ভী! ইণ্টেরেস্টিং কুছু নামের তালিকা পাঠানোর সময়ে আপনার কথা ভী ভাববে।”

মামা করুণ মুখ করে শেষে মা’র দ্বারস্থ হয়। “ইরা, তোর ইস্কুলের হেড স্যার এ পাড়াতেই তো থাকেন। চল না ওঁর কাছে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে যাই। তিনি গুণী কম কী! একটা ভালো রিভিউ দেবেন বৈ তো নয়!”

হেড স্যার নবকৃষ্ণবাবু থাকতেন স্টেশন রোডের দিকে। ব্যাচে ব্যাচে ছাত্র পড়াতেন। কম কথার ব্যস্ত মানুষ। একেবারে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়ে পড়া… মা দোনামনা করে শেষে রাজি হলেন।

পরদিন দু’ ভাই-বোন বেরলো যখন, ঝুপ করে লোডশেডিং। নবকৃষ্ণবাবু মোমের আলোয় ছাত্রের পাল নিয়ে বসেছিলেন। মামার কোলে পাণ্ডুলিপির বহর দেখে আর মায়ের আর্জি শুনে বললেন, “রেখে যান, পরে খবর দেবো।”

হপ্তাখানেক পরে রিক্সা চেপে নবকৃষ্ণবাবু আমাদের বাড়ি এলেন। নামলেন না। রিক্সায় বসে বসে তীব্র বিরক্তি নিয়ে মা’কে বললেন, “এত কেউ লেখে? রিক্সা নিতে হল!”

পরে পাণ্ডুলিপি খুলে দেখা গেল তার সর্বাঙ্গে লাল কালির দাগ। যেন কেউ হিমগ্লোবিনের ইঞ্জেকশান ঠুসে দিয়েছে গায়ে। মামা তো রেগে ফায়ার। “এটা কি জয়েণ্টের উত্তরপত্র না কি? তোদের কলকাতার লোকগুলোর সবতাতে বাড়াবাড়ি!”

শেষমেষ মামার মনে পড়ল গোপাল সামন্তর কথা। মা অবাক হয়ে বলল, “নাণ্টুদা, শেষে…!”

“থাম থাম!” মা’কে থামিয়ে মামা বললেন, “খারাপ কী? কলকাতার বুকে সাহিত্য করে পাগল হয়েছে। কী জিনিস, অ্যাঁ? শোন, আমার ইদিকে বেশীদিন আর থাকার জো নেই। তোর বৌদি আমাকে শাসিয়ে রেকেচে, ইরা। এসপার নয় ওসপার! একটা ভালো রিভিউ সহ একটা ভালো প্রকাশনী। ব্যস, তোর দাদাকে আর পায় কে!” মামার চোখ গাঢ় স্বপ্নালু হল। “শোন, গোপালদা এখন অনেক শান্ত সমাহিত। তার এখন বেশ উচ্চ সাহিত্য মহলে জানাশোনা। আমার সোর্স আছে, আমি শুনিচি সম্প্রতি ‘বাবল্’ নামে একটা কবিতা সংকলনের কবি ওনার বিশেষ গুণমুগ্ধ। আমি ভাবছি, ইরা, দেরী না করে কালই গোপালদা আর ওই বিখ্যাত ‘বাবল্’-এর বিদ্বান কবি…”

ঠিক তখনই জ্যাঠামশাই ভেতরবাড়িতে এসে বললেন, “বাবল্? তা সে লেখক আবার বিদ্বান হইল কবে! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! বড়বাজারের নুনের গোলায় খাতা লিখনের কাম করতো ওই সুশীল। হালে কম্যুনিস্ট পার্টির বগল খিঁমচাইয়া উঠনের চেষ্টায় আসে। ‘বাবল্’ আর কিস্যু না মশাই! মুড়ি আর মিসরিকে এক কইর‍্যা দিসে। অ ইরা, দ্যাশলাই থাকে তো দাও। আইজকাল লম্বা লম্বা কারেণ্ট যাইতাসে। পোঙার কাপড়, প্যাটের ভাত নাই, তয় বাবল্ উড়াইতাসে, হঃ!”

জ্যাঠা বিদেয় হলে মামা মুখ চুন করে বললেন, “দেখলি, কেন বলে বাঙালী বাঙালির শত্তুর?”

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

পরদিন সন্ধ্যেবেলা টাকে চকচকে চাঁদের আলো মেখে স-স্যাঙাত গোপাল সামন্ত এসে হাজির। সেদিনও সন্ধ্যে হতে না হতেই লোডশেডিং। চা-মুড়ি-বাদাম সহযোগে লোডশেডিং-এর মধ্যেই তাঁদের সভা বসলো। সারাদিনের ক্লান্তিতে মা বারান্দায় ঝিমুচ্ছিল, বাবা রেডিওতে গান শুনছিল। আমি আর দিদি সবে লণ্ঠনের আলো নিভিয়ে বই গোটাচ্ছি, হঠাৎ পাশের ঘর থেকে বাঘের মতন গলায় গোপালের আবৃত্তি উঠল —

“যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক
শুধু থাক একবিন্দু নয়নের জল!
কালের কপোলতলে
শুভ্র সমুজ্জ্বল, এ তাজমহল!”

আচমকা বাঘের ডাকে চমকে উঠে মা বিষম খেলো। আঁতকে উঠে বাবা রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে দিল। দিদির হাত থেকে পচাক করে গোটান মাদুর পড়ে গেল। তারপর শুরু হল সেই আবৃত্তির অগ্ন্যুৎপাত।

“এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শা-জাহান!
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান!”

লাগাতার সেই হুঙ্কারে পাড়ার শিশু কেঁদে উঠল, বুড়োদের ঝিম ভেঙে গেল। তারা মহাবিরক্ত হয়ে ওই গরমেও জালনা দরজা ঝটপট বন্ধ করে দিলো। আমরা কান চেপে ধরলাম। মা বলল, বুকে বেদনা উঠেছে। রবিঠাকুর যখন এ পদ্যখানি লিখেছিলেন তখন গোপাল সামন্তের হাতে পড়ে এর কী হাল হতে পারে ভাবেননি, তাই দশাসই কলেবর সাজিয়ে নিজের মনের মাধুরী লিখেছিলেন। কিন্তু একঘণ্টা যাবত ওই আবৃত্তির গোলা যখন আমাদের বৈঠকখানা থেকে এসে ছিটকাতে লাগল, তখন আমরা সব আধমরা হয়ে গেলাম। পরিস্থিতি সামলাতে কানে তুলো গুঁজে বাবা গিয়ে বলল, “গোপালদা, গোপালদা, ব্যস ব্যস!”

আর ব্যস! সে তখন পূর্ণিমার আলো দেখে ক্ষেপে গেছে। থেকে থেকে চেয়ার থেকে গোঁত্তা মেরে ওঠে আর হুঙ্কার দেয় —
“হায় ওরে মানব হৃদয়!
বার বার কারও পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়! নাই নাই!”

বাবা বলে, “গোপালদা, জল খান। কিছু খাবেন? সিঙাড়া?”

গোপাল অনর্গল বলে চলে —
“রাজ্য ভাঙা গড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া!”

বাবা রক্তচক্ষুতে এক কোণে সিঁটিয়ে বসে থাকা মামাকে দেখে বলল, “দেখছ কি বসে? চুপ করাও একে! এখনও বহুৎ বাকি। এই কবিতাটা পড়োনি কি?”

গোপালের স্যাঙাত হাততালি দিয়ে মিহি গলায় বলে উঠল, “বাঃ, অন্তমিল! ছন্দশীল! আমি মশাই, সুশীল!”

গোপাল বলল, “মিথ্যা কথা!”

সুশীল ভড়কে বলে, “অ্যাঁ? তাইলে আমি কেডা?”

গোপাল খেই ধরে —
“মিথ্যা কথা!
কে বলে ভোল নাই?
কে বলে রে খোল নাই!
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার!”

দিদি মুখ ভেটকে বলল, “এ ব্যাটার স্মৃতির দ্বার না ইয়ের দ্বার রে? নন্ স্টপ্ বের করে যাচ্ছে!”

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

শেষে বাবা গোপালের হাঁটু ধরে ঝুলে পড়ল — “দাদা! চুপ রও! চল, বাড়ি চল। পুলিশ আসলো বলে তোমার এই চীৎকারে। কী গেরোয় পড়লুম! ও দাদা, থামো!”

গোপাল গড়গড়ায় —
“মহারাজ, কোন মহারাজ্য
কোনদিন পারে নাই
তোমারে ধরিতে।
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট…”

হঠাৎ মামা ডুকরে কেঁদে উঠলেন — “অ ইরা, এ মালটা যে থামছে না রে! কিছু একটা কর না!”

মা পাথর কঠিন গলায় বলল, “আর একটু সবুর সও না। আরও ধরো মিনিট চল্লিশ। শেষ করে আনছে প্রায়!”

দিদি ফুঁপিয়ে উঠল, “কাকে শেষ করে আনছে মা?”

ওঃ সে কী সভা! মামার ফোঁপানি, বাবার কাতরানি, আর গোপালের —
“বারম্বার! তাই,
চিহ্ন তব পড়ে আছে,
তুমি হেথা নাই!”

শেষে স্যাঙাতই বুদ্ধি দিলে, “ও মশাই! বৌদিরে ডেকে আনুন! এ যদি আবার রিভার্স মোডে চলে যায় না…”

“অ্যাঁ? কী জিনিস, অ্যাঁ? ইরা…আ…আ…অ ইরা,” বলে মামা রীতিমত কান্না জুড়ে দিলেন। বাবার নির্দেশে আমি ছুটলাম সামন্ত গিন্নীকে আনতে।

টানা তিন ঘণ্টার উপর্যুপরি বাবা বাছা করে ভোলানোর চেষ্টায় গিন্নীর কাঁকাঁল ধরে গোপাল সামন্ত যখন সাহিত্যবাসর ভঙ্গ করল, রাত বাজে দেড়টা। তখনও আলো আসেনি!

কালস্রোতে একদিন সত্যিই জীবন যৌবন ধনমান ভেসে গেল। দিদির বিয়ে হয়ে গেল। গোপাল সামন্ত ইহজগতের কালো দরজা পেরিয়ে মুক্তির আলোয় চলে গেল, চলে গেল বাবাও। বইমেলা ধুলোমাটির গন্ধ ছেড়ে প্রাতিষ্ঠানিক হল। মেলা মেলা ভাব কেটে গিয়ে বাণিজ্যিক চাকচিক্যভরা হল। বইমেলায় বাবার দেওয়া কুড়ি টাকা বুকে ধরে গড়ের মাঠের ধুলোয় ভূত হয়ে অমূল্যধন কুড়োনর দিন শেষ হল!

মামার আসা কমে গেল। আসার হলে মামী ফোনে বলে দিতেন, “পিপুল! তোর মামা এখন টুণ্ডলায় বাঙালী গোষ্ঠী আয়োজিত ম্যাগাজিন নিয়ে মেতেছে। এবছর বোধহয় বইমেলায় যাবে। তুই সঙ্গে থাকিস বাবা, শুনেছি বাস পেতে অনেক হাঁটতে হয়।”

সেই অনেক বছর আগে বইমেলার শেষদিনে একবার মামার বারণ সত্ত্বেও গেলাম। মামাদের লিটিল ম্যাগের স্টলে গিয়ে দেখি মাটির ভাঁড়ে চা গলাধঃকরণ করতে করতে পাশের এক শান্তিনিকেতনী ঝোলাধারীকে মামা বলছেন — “তোমরা সব উঠতি লেখক, তোমাদের আর আমি কী বলব? দেশের সাহিত্যের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছ? ত্রিশটা বছর আমি হাত পুড়িয়েছি, এখনও জ্বলছে! এখন তোমরা বোঝ!”

ঝোলাধারীর মুখ ঝুলে গেল। আমি গলা খাঁকড়ালাম। আমাকে দেখে মামা মহাখুশী। “অ, পিপুল! এই দ্যাখ দেশের নব্য লেখক। আমাকে ওদের ফার্ম হাউসে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যেতে চায়। বাগানের টাটকা মাছ, ফলমূল, দুধ ননী, লাল কমলও আছে। কিন্তু বিনিময়ে আমি কী দেবো! আমি তো নো ওয়ান!”

মামাকে নিয়ে বাসরাস্তা ধরি। বাসে যা ভিড়, শেষে একটা ট্যাক্সিই নিলাম। মামা ট্যাক্সিতে উঠে নীরব হয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎই বললেন, “পিপুল, এই আমার শেষ বইমেলা। মনে আছে, তোর বাবা লালকমলে নীল কমল হয়ে বসার কথা বলেছিল? সেদিন রেগে গিয়ে তাকে কেরানী বলে গাল দিয়েছিলুম। কিন্তু সে দূরদর্শী লোক ছিল রে পিপুল! সে ঠিকই বলত, মাথাটা পিটোবার জন্য নয়, খাটাবার জন্য।… প্লট প্লট করে জীবনটা পাত করে দিলুম। প্লটের চোখ নিয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত দেখলুম।

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

সম্পর্কগুলোও প্লটের তাগিদে গড়লুম, ভাঙলুম। কিন্তু দিনশেষে পেলুম কী? এ কীসের সাহিত্যযজ্ঞ চলছে আজ, পিপুল? কার আরাধনা?”

মামা বলে চলেন, “আমাদের মতন লেখকরা শালা চোখে প্লটের ধান্ধার ঠুলি পরে জীবনটাকে দেখে। একগাদা ইনফারমেশানের বমি করে ভাবে সাহিত্য করলুম। ধিক্ শালা! একটা পাঠককে যদি হাউমাউ বুক ভাঙা কাঁদাতে পারতুম, সব দুঃখু মুছিয়ে হো হো হাসাতে পারতুম, তো বুঝতুম। কোথা থেকে পারবো! সেই রসবোধটাই খুইয়ে বসে আছি যে! ধান্ধার চক্করে। প্লট খোঁজার হ্যাংলামিতে। কিন্তু সেই অযূত রসবোধ তোর বাবার মধ্যে ছিল। তার চলনে বলনে, আচারে ব্যবহারে। কারণ জীবনটাকে ওই কেরানীবাবু চোখের আলোয় শুধু নয়, মনের আলোয় দেখেছিল রে! তোর বাবা সাহিত্যের কমলে কামিনী দেখেনি ঠিকই, তবে ব্যাটা ছিল সাক্ষাৎ একজন কমলে কেরানী! নো, নো, হাসবি না!”

— “ও ভায়া, তুমি যে দিব্য এক ঘুম মেরে নিলে হে! আবার ভাগ্যবানের ভাগ্য দেখ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হেসেও নিলে! চল, চল, মেলা শেষ। কোথাও জমিয়ে বসে দুটো পেগ মারা যাক!”

বন্ধুর ডাকে ঘোর কাটতে বললাম, “বিক্রি বাটা?”

বন্ধু বললে, “কে ঘামায় মাতা?”

আবার জীবনের পথে নামলাম।

নতুন লেখা মিস্ করবেন না।
ই-মেলে লেখা পাওয়ার জন্য ক্লিক্ করুন এখানে!

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com